# দ্য গড অব স্মল থিংস

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ

জামাল নাসের

ঢাকা : বাংলা মোটর | শাহবাগ | বাংলাবাজার
চট্টগ্রাম | রাজশাহী | সিলেট

# ১

## প্যারাডাইজ পিকলস অ্যান্ড প্রিজার্ভস

মে মাসে আইমেনেমে বেশ গরম পড়ে। এটা গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাওয়ার মাস। দিনগুলো বেশ লম্বা আর আর্দ্রতায় ভরা। নদীগুলো শুকিয়ে যায়। কাকগুলো ধুলোয় ভরা সবুজ গাছে বসে রং ধরা উজ্জ্বল আমগুলোর গায়ে অনবরত ঠোকরাতে থাকে। লাল কলাগুলো পেকে যায়। কাঁঠালগুলো ফেটে যায়। বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়া ফলের গন্ধে নীল মাছিগুলো ভনভন করে উড়ে বেড়ায়। এরপর ওরা জানালার স্বচ্ছ কাচের গায়ে ধাক্কা খেয়ে উজ্জ্বল সূর্যের নিচে পাখা ছড়িয়ে মরে পড়ে থাকে। তাদের চোখে ফুটে থাকে অপার বিস্ময়।

রাতগুলো পরিষ্কার। কিন্তু তার মধ্যে থাকে আলস্য ও বিষণ্নতার ছোঁয়া।

জুনের প্রথমভাগেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ুর আগমন ঘটে এবং পরবর্তী তিন মাস ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি ঝরতে থাকে আর বাতাস বইতে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দেয়। তখন বাচ্চারা খেলার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে।

গ্রাম এলাকা গভীর সবুজে ছেয়ে যায়। সাবু গাছগুলোতে শিকড় গজায় ও ফুল ফোটে। সেগুলোর বেড়ার আড়ালে মাঠের সীমানাগুলো ঢেকে যায়। ইটের দেয়ালগুলোয় শেওলা রং ধরে। গোলমরিচের লতা সাপের মতো ওপরে উঠে যায় বিদ্যুতের খুঁটি জড়িয়ে। বুনো লতা মাটি ভেদ করে উঠে এসে জলে ডোবা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে থাকে। বাজারে নৌকার ভিড় জমে। মহাসড়কে পূর্ত বিভাগের খোঁড়া গর্তগুলো ভরে যায় ছোট মাছে।

রাহেল যখন আইমেনেমে ফিরে এল, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। রুপালি বৃষ্টির ধারা আলগা মাটির ওপর ঝরে পড়ছিল প্রবল বেগে, ঠিক বন্দুকের গুলির মতো। সে আঘাত মাটিকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। টিলার ওপর বাড়িটির অস্পষ্ট ছাদ দেখে মনে হচ্ছিল সেটির কানের ওপর একটি নিচু টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুইয়ে পড়া পানিতে শেওলাঢাকা দেয়ালগুলো হয়ে গিয়েছিল স্যাঁতসেঁতে ও নরম। দ্রুত বেড়ে ওঠা বুনো গাছটি ছোট ছোট প্রাণীর কোলাহলে ভরে গিয়েছিল। লতাগুল্মের জঙ্গলে একটি নির্বিষ সাপ নিজের গা ঘষছিল একটি উজ্জ্বল পাথরের গায়ে।

ব্যাঙগুলো সঙ্গীর আশায় সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল পুকুরের নোংরা জলে। বৃষ্টিভেজা একটি বেজি পাতা বিছানো রাস্তাটি দৌড়ে পেরিয়ে গেল।

দেখে মনে হচ্ছিল বাড়িটিতে কেউ নেই। দরজা ও জানালাগুলো বন্ধ। সামনের বারান্দা খালি। কোনো আসবাব নেই। কিন্তু ক্রোমিয়ামের পুচ্ছ-পাখনাযুক্ত, আকাশ-নীল প্লিমাউথ গাড়িটি তখনো বাইরে পার্ক করা এবং বাড়ির ভেতরে ছিলেন বেবি কোচামা। তখনো জীবিত।

তিনি ছিলেন রাহেলের নানি, তার নানার ছোট বোন। আসলে তার নাম নবমী আইপ। কিন্তু সবাই তাকে বেবি ডাকতেন। যখন তার যথেষ্ট বয়স হয় এবং খালা হয়ে যান, তখনো তিনি বেবি কোচামাই রয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য রাহেল তাকে দেখতে আসেনি। নাতনি বা নানির কারোরই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। রাহেল এসেছিল তার ভাই এসথাকে দেখতে। তারা ছিল আলাদা কিন্তু একই সঙ্গে পরিপক্ব হওয়া দুটি আলাদা ভ্রূণ থেকে জন্ম নেওয়া যমজ ভাইবোন। এসথা এসথাপ্পেন ছিল রাহেলের আঠারো মিনিটের বড়।

তাদের দেখে কখনোই মনে হতো না যে একজনের সঙ্গে আরেকজনের খুব একটা মিল রয়েছে। এমনকি যখন তাদের হাত ছিল খুব হালকা-পাতলা, বুক সমতল, শরীর কৃমি আক্রান্ত এবং চুল ছিল এলভিস প্রিসলির মতো ফোলা, তখনো মনে হতো না। তাই স্বাভাবিকভাবে যেটা ঘটে থাকে সেভাবে কেউ প্রশ্ন করতেন না যে কোনটা কে? তাদের আত্মীয়স্বজন এবং চাঁদা নেওয়ার জন্য যেসব নিষ্ঠাবান বিশপ প্রায়ই আইমেনেমে তাদের বাড়িতে আসতেন, কেউই এ প্রশ্ন করতেন না।

আসল গোলমালটা ছিল আরও গভীরে, আরও গোপন জায়গায়।

জীবনের শুরুর দিকের বছরগুলো, যার কথা মানুষ ভুলে যায়, যখন স্মৃতি কেবল অস্তিত্ব লাভ করতে শুরু করে, জীবনটা কেবল শুরু হয়, মনে হয় এর কোনো অন্ত নেই এবং পৃথিবীর সবকিছুই চিরকালের বলে মনে হয়, সে সময়টিতে এসথাপ্পেন ও রাহেল নিজেদের একই অস্তিত্ব বলে ভাবত। যখন একসঙ্গে থাকত, তখন নিজেদের দুজনকে আমি হিসেবে ভাবত; যখন আলাদা ও স্বতন্ত্রভাবে থাকত, তখন নিজেদেরকে ভাবত আমরা ও আমাদের হিসেবে। তারা ছিল বিরল প্রজাতির সিয়ামিজ যমজ। তাই দৈহিকভাবে আলাদা হলেও তাদের পরিচিতি ছিল এক।

এখন, এত বছর পর এক রাতে এসথার একটা মজার স্বপ্নের কথা মনে পড়লে রাহেল মুখ চেপে হাসতে লাগল। রাহেলের আরও অনেক স্মৃতি আছে এসথাকে নিয়ে যেগুলোতে তার কোনো অধিকার নেই।

যেমন তার মনে আছে (যদিও সে সেখানে ছিল না) অভিলাষ টকিতে অরেঞ্জ ড্রিংক ও লেমন ড্রিংক বিক্রেতা এসথার সঙ্গে কী করেছিল। মাদ্রাজ মেইলে মাদ্রাজ

যাওয়ার পথে যে টমেটো স্যান্ডউইচ *এসথা* খেয়েছিল, তার স্বাদ এখনো রাহেলের মনে আছে।

এবং এগুলো খুবই ছোট ঘটনা।

যা হোক এখন সে এসথা ও রাহেলকে *তাদের* হিসেবে ভাবে। আলাদা মানুষরূপে। কারণ একসময় *তারা* নিজেদের যেভাবে ভেবেছিল, এখন *তারা* আর সে রকম নেই।

হয়তো চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এখন তাদের জীবন একটি নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি নিয়েছে। এসথা ও রাহেলের যার যার নিজস্ব জীবন রয়েছে।

তাদের আলাদা জীবন-দিগন্তে দানবের মতো এসে দাঁড়িয়েছে দেয়াল, সীমারেখা আর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। ক্ষুদ্র প্রাণীগুলো দীর্ঘ ছায়া ফেলে অস্পষ্টভাবে তাদের পথের প্রান্তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখের সামনে জীবন ও মৃত্যুর ছবি এসে জড়ো হয়েছে। তাদের আম্মু যে বয়সে মারা গিয়েছিলেন, এখন তাদের ঠিক সে বয়স। তখন তার বয়স ছিল একত্রিশ।

বৃদ্ধা নয়।

তরুণী নয়।

কিন্তু মোটামুটি মরার মতো বয়স।

আরেকটু হলে বাসের মধ্যেই এসথা ও রাহেলের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। তাদের বাবা যে গাড়িতে করে তাদের আম্মুকে শিলংয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আসামের একটি চা-বাগানের রাস্তার পাশে এসে গাড়িটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটি ওখানে ছেড়ে তারা যাত্রীভর্তি একটি স্টেট বাসে উঠে পড়লেন। বাসের গরিব যাত্রীরা দেখলেন যে বাবা তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধনী। অথবা সম্ভবত তারা অনুধাবন করলেন যে আম্মুর গর্ভাবস্থা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই সিটে বসা যাত্রীরা সহানুভূতি দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জন্য জায়গা করে দিলেন। বাকি পথটা রাহেল ও এসথার বাবাকে হাত দিয়ে তাদের মায়ের পেট চেপে ধরে রাখতে হয়েছিল (তাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তারাসহ), যাতে পেটে কোনো ঝাঁকি না লাগে। এর পরেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আম্মু কেরালায় ফিরে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

এসথা বলে, বাসের মধ্যে যদি তাদের জন্ম হতো, তাদের আর বাসভাড়া দিতে হতো না। এ তথ্য সে কীভাবে জেনেছিল তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে সারা জীবন বিনা ভাড়ায় বাসে চড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য বহুদিন তারা বাবা-মায়ের ওপর ক্ষোভ পুষে রেখেছিল।

তারা আরও বিশ্বাস করত যে তারা যদি জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপরে মারা যায়,

সরকার তাদের শেষকৃত্যের খরচ বহন করবে। তাদের নিশ্চিত ধারণা ছিল, জেব্রা ক্রসিং মানেই হলো বিনা পয়সায় সৎকারের সুযোগ। তবে আইমেনেমে কোনো জেব্রা ক্রসিং ছিল না। তাই জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপর মরার কোনো সুযোগ ছিল না। এমনকি আইমেনেমের মতোই নিকটতম শহর কোট্টাইয়ামেও কোনো জেব্রা ক্রসিং ছিল না। কিন্তু যখন তারা কোচিনে গিয়েছিল, সেখানে গাড়ির জানালা দিয়ে কয়েকটি জেব্রা ক্রসিং দেখেছিল। কোচিন ছিল গাড়িতে দুই ঘণ্টার পথ।

সোফি মলের শেষকৃত্যের খরচ সরকার দেয়নি। কারণ সে জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপর মারা যায়নি। আইমেনেমের নতুন রং করা পুরোনো গির্জায় তার শেষকৃত্য হয়েছিল। সে ছিল এসথা ও রাহেলের মামাতো বোন, তাদের মামা চাকোর কন্যা। লন্ডন থেকে বেড়াতে এসেছিল। যখন সে মারা যায়, এসথা ও রাহেলের বয়স সাত বছর। সোফি মলের বয়স ছিল নয় বছরের কাছাকাছি। তার জন্য ছোট আকারের একটি বিশেষ কফিন তৈরি করা হয়েছিল।

মখমলের কাজ করা।

এর পিতলের হাতল ছিল ঝকঝকে উজ্জ্বল।

তার কোঁচকানো হলুদ বেলবটমটি পরে সোফি কফিনের ভেতরে শুয়ে ছিল। চুলগুলো ছিল রিবন দিয়ে বাঁধা। ইংল্যান্ডের তৈরি গো-গো ব্যাগটি তার সঙ্গে ছিল। ওটা ছিল তার খুব প্রিয়। তার মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। অনেকক্ষণ জলে থাকার ফলে ধোপার বুড়ো আঙুলের চামড়া যেমন কুঁচকে যায়, তেমনি কুঁচকে গিয়েছিল তার মুখের চামড়াও। লোকজন সবাই জড়ো হয়েছিল কফিনের চারদিকে। শোক সংগীতের সুরে হলুদ গির্জাটি বেদনায় ভরে উঠেছিল। কোঁকড়ানো দাড়িওয়ালা যাজকেরা লোবানের পাত্রগুলো দুলিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতি রোববার প্রার্থনার সময় তারা হাসিমুখে শিশুদের দিকে তাকান। আজ তাদের মুখে কোনো হাসি ছিল না।

বেদির ওপর রাখা লম্বা মোমবাতিগুলো হেলে পড়েছিল। কিন্তু ছোটগুলো খাড়া হয়েই ছিল।

একজন বৃদ্ধা, তিনি সোফির দূরসম্পর্কের আত্মীয় হবেন, (কেউ তাকে চিনত না) সব সময় লাশের পাশে পাশে ছিলেন (পারলৌকিক কাজের প্রতি আসক্তি? মৃতদেহের প্রতি গোপন আসক্ত মহিলা?)। এক টুকরো তুলিতে সুগন্ধি মাখিয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে সেটা তিনি সোফি মলের কপালে লেপে দিলেন। সোফি হয়তো সে সুগন্ধি আর কফিনের কাঠের গন্ধ নিল।

সোফির ইংরেজ মা মার্গারেট কোচামা সোফির জন্মদাতা বাবা চাকোকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন, যাতে নিজেকে একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পুরো পরিবার একসঙ্গে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ছিল। মার্গারেট কোচামা,

চাকো, বেবি কোচামা এবং তার পাশে তার ভাবি মামাচি—এসথা ও রাহেলের (সোফি মলেরও) ঠাকুরমা। মামাচি ছিলেন প্রায় অন্ধ এবং বাড়ির বাইরে গেলে তিনি সব সময় একটি কালো চশমা পরতেন। চশমার ভেতর থেকে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল এবং ছাদের প্রান্ত থেকে যেমন বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে, তেমনি সেগুলোও ঝরে পড়ছিল তার চিবুক বেয়ে। কুঁচকে যাওয়া ধূসর-সাদা শাড়িতে তাকে আরও ছোট ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। চাকো ছিলেন মামাচির একমাত্র পুত্র। তিনি খুব শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন। চাকোর দুঃখ তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

আম্মু, এসথা ও রাহেলকে শেষকৃত্যে থাকার অনুমতি দেওয়া হলেও আলাদাভাবে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি। তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না।

গির্জার ভেতরটা ছিল বেশ গরম। অ্যারাম লিলির সাদা প্রান্তগুলো শুকিয়ে মচমচে হয়ে গিয়েছিল এবং কুঁকড়ে গিয়েছিল। একটি মৌমাছি মরে পড়ে ছিল কফিনের একটি ফুলের ভেতর। আম্মুর হাতগুলো নড়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে তার হাতে থাকা হাইমবুকটিও। তাতে তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল এসথা। সে অনেক কষ্টে জাগিয়ে রেখেছিল নিজেকে। তার চোখ জ্বালা করছিল, চকচক করছিল কাচের মতো। সে তার চিবুক লাগিয়ে রেখেছিল আম্মুর কম্পমান শরীর ও হাইমবুক ধরা হাতের সঙ্গে।

অন্যদিকে রাহেল ছিল পূর্ণ সজাগ, খুবই সতর্ক। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

সে দেখল সোফি মল নিজের শেষকৃত্য দেখার জন্য জেগে রয়েছে। সে রাহেলকে দুটো জিনিস দেখাল।

প্রথমটি হলো হলুদ গির্জার উঁচু গম্বুজ, যেটা নতুনভাবে রং করা হয়েছে। রাহেল ওটা ভেতর থেকে আগে কখনো দেখেনি। সেটা ছিল নীল রং করা, আকাশের মতো। সেখানে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে এবং মেঘের ভেতর দিয়ে সাদা পথ ধরে আড়াআড়িভাবে ছুটে যাচ্ছে ছোট জেটপ্লেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হাইমবুক হাতে শোকে মুখ বুজে গির্জার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে এ জিনিসগুলো দেখার চেয়ে কফিনের ভেতর শুয়ে এগুলো দেখা অনেক সহজ।

যারা রঙের কৌটা নিয়ে কষ্ট করে ওখানে উঠেছিল, রাহেল তাদের কথা চিন্তা করল। মেঘের ছবি আঁকার জন্য সাদা রং, আকাশের জন্য নীল রং, জেটের জন্য রুপালি। এরপর রয়েছে তুলি ও থিনার। সে কল্পনা করল ভেলুথার মতো কেউ ওখানে উঠে বসেছে। তার খালি গা চকচক করছে, গির্জার উঁচু গম্বুজ থেকে ঝোলানো কাঠের তক্তার ওপর সে বসে আছে এবং একটি গির্জার নীল আকাশে জেটের ছবি এঁকে চলেছে।

সে ভাবল দড়িটা ছিঁড়ে গেলে কী হতো? কল্পনার চোখে সে দেখল নিজেরই আঁকা একটি কালো তারার মতো আকাশ থেকে লোকটি ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। তার শরীর গির্জার গরম মেঝেতে দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে। তার মাথার খুলি থেকে স্রোতের মতো কালো রক্ত বেরিয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে এসথাপ্পেন ও রাহেল বুঝে গিয়েছিল যে মানুষকে ভেঙে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আরও অনেক পথ রয়েছে। এর মধ্যেই তারা সে গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। যেমন বাতাসে ভেসে আসা বাসি গোলাপের ঘ্রাণের মতো অসুস্থ গন্ধ।

দ্বিতীয়টি হলো সোফি মল রাহেলকে বাদুড়ের বাচ্চাটি দেখাল।

রাহেল দেখল একটি ছোট কালো বাদুড় তার কোঁকড়ানো থাবা দিয়ে আলতোভাবে বেবি কোচামার দামি শাড়িটি আঁকড়ে ধরে সেটা বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। শাড়িটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পরেছিলেন। বাদুড়টি যখন শাড়ি আর ব্লাউজের মাঝামাঝি তার নগ্ন পেটের কাছে এসে পৌঁছাল, বেবি কোচামা চিৎকার করে উঠলেন এবং তার হাতে থাকা প্রার্থনার বই দিয়ে বাতাসে আঘাত করতে লাগলেন। প্রার্থনা সংগীত থেমে গেল। সবাই জানতে চাইল কী ঘটেছে? বেবি কোচামা তার শরীর ও শাড়ি ঝাপটাতে লাগলেন।

বিষণ্ন যাজকেরা তাদের কোঁকড়ানো দাড়ি থেকে ধুলো ঝাড়ার জন্য আংটি পরা আঙুলগুলো দাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে সঞ্চালন করতে লাগলেন, যেন লুকিয়ে থাকা মাকড়সা সেখানে জাল বুনে রেখেছে এবং সেগুলো তারা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন।

ছোট্ট বাদুড়টি আকাশে উড়ে গেল এবং মোড় নিল একটি জেটের দিকে।

একমাত্র রাহেলই সোফি মলের লুকানো মালবাহী গাড়ির চাকাটি তার কফিনে দেখতে পেল।

শোক সংগীত আবার শুরু হলো এবং তারা একই শোকের গান দুবার গাইলেন। আওয়াজ করতে গেলে গলা যেমন ফুলে ওঠে, তাদের কণ্ঠের শব্দে হলুদ গির্জাটি আবার যেন সে রকম ফুলে উঠল।

গির্জার পেছনে ছোট সমাধিস্থলের মাটিতে তারা যখন সোফি মলের কফিনটি নামাল, রাহেলের মনে হলো সোফি তখনো মারা যায়নি। সে (সোফি মলের পক্ষ থেকে) লাল কাদার নরম শব্দ এবং শক্ত হয়ে যাওয়া কমলা রঙের মাটির কর্কশ শব্দ শুনতে পেল। ওই শক্ত মাটি কফিনের উজ্জ্বল পালিশকে নষ্ট করে দিয়েছিল। কফিনের পালিশ করা কাঠ এবং কফিনের রেশমি কাপড়ের লাইনিংয়ের মধ্য দিয়ে সে নিস্তেজ, ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল। কাদা ও কাঠের শব্দে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছিল বিষণ্ন যাজকদের কণ্ঠ।

আমরা গভীর বিশ্বাসে তার হাতে সঁপে দিচ্ছি, হে সবচেয়ে দয়ালু পিতা
আমাদের শিশুর আত্মা দেহত্যাগ করেছে,
এবং আমরা তার দেহ মাটিতে সমর্পণ করছি,
মাটি থেকে মাটিতে, ভস্ম থেকে ভস্মে, ধূলি থেকে ধূলিতে।

মাটির ভেতরে সোফি মল আর্তনাদ করে উঠল এবং দাঁত দিয়ে রেশমি কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু মাটি ও পাথরের মধ্য দিয়ে সে চিৎকার আপনার কানে আসবে না।

নিশ্বাস নিতে না পারায় সোফি মল মারা গেল।

তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাকে খুন করে ফেলল। *তার কবরের স্মৃতিফলকে লেখা হলো সূর্যের একটি কিরণ, যা আমাদের ধার দেওয়া হয়েছিল খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য।*

পরে আম্মু তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খুবই সংক্ষিপ্ত সময় বলতে অল্প কয়েক দিন বোঝানো হয়েছে।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর আম্মু তার যমজ বাচ্চাদের নিয়ে কোট্টাইয়াম পুলিশ স্টেশনে এসেছিলেন। বাচ্চারা আগে থেকেই ওই জায়গার সঙ্গে পরিচিত ছিল। আগের দিনের অনেকটা সময় তারা এখানে কাটিয়েছিল। তারা তাদের নাকের ছিদ্র বন্ধ করে নিল দেয়াল এবং আসবাব ভেদ করে আসা পুরোনো প্রস্রাবের গন্ধ পাওয়ার বেশ আগেই। পূর্বানুমান থেকেই সেটা তারা করেছিল।

আম্মু স্টেশন অফিসারের খোঁজ করলেন। তাকে তার অফিস দেখিয়ে দেওয়া হলো। আম্মু তাকে বললেন, মারাত্মক একটি ভুল হয়ে গেছে এবং তিনি একটি বিবৃতি দিতে চান। তিনি ভেলুথার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

ইন্সপেক্টর থমাস ম্যাথুর গোঁফগুলো এয়ার ইন্ডিয়ার বন্ধুভাবাপন্ন মহারাজার গোঁফের মতো ব্যস্ততার সঙ্গে নড়াচড়া করছিল। কিন্তু তার চোখগুলোর মধ্যে ছিল চালাকি আর লোভ।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা একটু দেরি হয়ে গেছে?' তিনি বললেন।

তার কথায় মালয়ালমের কোট্টাইয়াম ভাষার টান ছিল। কথা বলার সময় তার চোখগুলো আম্মুর বুকের দিকে তাকিয়েছিল। তিনি বললেন, পুলিশের যা জানা দরকার তার সবই তারা জানে। কোনো *বেশ্যা* বা তার জারজ সন্তানের জবানবন্দি তারা নিতে চায় না। আম্মু বললেন, তিনি দেখে নেবেন এ বিষয়ে কী করা যায়। থমাস ম্যাথু তার ডেস্কের অন্য পাশে চলে এলেন এবং ব্যাটন হাতে নিয়ে আম্মুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, 'আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে চুপচাপ বাড়ি চলে যেতাম।' এরপরে তিনি তার বাটনটি দিয়ে আলতোভাবে মায়ের স্তনে চাপ দিলেন। *ট্যাপ, ট্যাপ*। যেন তিনি একটি ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে আম পছন্দ করছেন। পছন্দের আমগুলো নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন প্যাকেট করে দেওয়ার জন্য। কাকে তুলে আনতে হবে এবং কাকে আনতে হবে না মনে হলো ইন্সপেক্টর ম্যাথু তা ভালোভাবেই জানতেন।

তার পেছনে একটি লাল রঙের বোর্ডে নীল রঙে লেখা ছিল :

পোলাইটনেস
অবিডিয়েন্স
লয়ালটি
ইন্টেলিজেন্স
কার্টিসি
এফিশিয়েন্সি

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আম্মু কাঁদছিলেন। তাই এসথা ও রাহেল তাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না *বেশ্যা* মানে কী অথবা *জারজ* অর্থ কী? এই প্রথম মাকে কাঁদতে দেখল তারা। তিনি কোনো শব্দ করছিলেন না। তার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ছিল। কিন্তু ঝরঝর করে পানি বেরিয়ে আসছিল চোখ থেকে, গড়িয়ে পড়ছিল শক্ত চিবুকের ওপর দিয়ে। এটা বাচ্চাদের ভীত অসুস্থ করে তুলল। যেসব এতক্ষণ অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলোকে বাস্তব করে তুলল আম্মুর চোখের জল। বাসে চড়ে তারা আইমেনেমে ফিরে গেল। বাসের রড ধরে তার শরীরটিকে পিছলে নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল খাকি পোশাক পরা রোগা এক কন্ডাক্টর। সে তার হাড্ডিসার পাছাটা একটি সিটের পেছনে ঠেস দিয়ে রেখে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়াল। তার টিকিট পাঞ্চ করার মেশিনটা আম্মুর দিকে বাড়িয়ে ধরে সেটা দিয়ে ক্লিক করে শব্দ করল। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করল, *কোথায় যাবেন*? তার ক্লিক শব্দের অর্থই ছিল সেটা। রাহেল টিকিটের গোছার গন্ধ পাচ্ছিল এবং বাসের স্টিলের রড ধরে রেখে কন্ডাক্টরের হাত যে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, তা সে বুঝতে পারছিল।

'সে মারা গেছে,' আম্মু ফিসফিস করে নিজেকেই বললেন। 'আমি তাকে মেরে ফেলেছি।'

'আইমেনেম,' এসথা তাড়াতাড়ি বলল কন্ডাক্টর তার মেজাজ হারিয়ে ফেলার আগেই।

আম্মুর ব্যাগ থেকে সে টাকা বের করে কন্ডাক্টরকে দিল। কন্ডাক্টর তার হাতে

দিল টিকিটগুলো। সেগুলো সে সতর্কতার সঙ্গে ভাঁজ করে পকেটে রাখল। তারপরে তার ছোট হাতদুটো দিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল। তিনি কাঁদছিলেন।

দুই সপ্তাহ পরে এসথাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাকে তাদের বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আম্মুকে বাধ্য করা হয়েছিল। তার বাবা তখন আসামের চা-বাগানের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায় এবং কার্বন ব্ল্যাক তৈরির একটি কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন। আসামের চা-বাগানে খুব একা লাগত তাঁর। তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন এবং মদ্যপান প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে কখনো সখনো মাতাল হয়ে পড়তেন।

এরপর এসথা ও রাহেলের আর দেখা হয়নি।

আর এখন, তেইশ বছর পরে, তাদের বাবা এসথাকে আবার আইমেনেমে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। হাতে দিয়েছিলেন একটি স্যুটকেস আর চিঠি। স্যুটকেসটি সুন্দর সব নতুন কাপড়চোপড়ে ভরা। বেবি কোচামা রাহেলকে চিঠিটি দেখালেন। চিঠির অক্ষরগুলো ছিল বাঁকা। মনে হচ্ছিল মেয়েলি হাতের লেখা। কথাগুলোয় কনভেন্ট স্কুলের ছাপ। নিচে স্বাক্ষর ছিল তাদের বাবার। অন্তত নামটি তার বাবার ছিল। চিঠিতে বলা হয়, তাদের বাবা কার্বন ব্ল্যাক কোম্পানি থেকে অবসরে গিয়েছেন এবং একজন অভিবাসী হিসেবে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি একটি সিরামিক ফ্যাক্টরিতে চিফ অব সিকিউরিটি পদে কাজ পেয়েছেন। এসথাকে তিনি সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন না। আইমেনেমের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কখনো যদি ভারতে ফিরে আসেন, তখন এসথার দেখাশোনা করবেন। কিন্তু তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।

বেবি কোচামা রাহেলকে বললেন, সে চাইলে চিঠিটা নিজের কাছে রাখতে পারে। রাহেল সেটা আবার খামে ঢুকিয়ে রাখল। কাগজটি নরম হয়ে কাপড়ের মতো ভাঁজ হয়ে গিয়েছিল।

সে ভুলেই গিয়েছিল আইমেনেমের মৌসুমি হাওয়া কতটা স্যাঁতসেঁতে হতে পারে। ফুলে যাওয়া কাপবোর্ডগুলো খোলার সময় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়। বন্ধ জানালাগুলো খুলতে গেলে বিকট শব্দ করে ওঠে। বইগুলো নরম হয়ে গিয়েছিল, মলাটের মাঝখানে পাতাগুলো হয়ে পড়েছিল ঢেউয়ের মতো। সন্ধ্যায় অদ্ভুত ধরনের পোকা বেরিয়ে আসে এবং নিজেদের পুড়িয়ে মারে বেবি কোচামার চল্লিশ ওয়াটের বাল্বের গায়ে। তাদের পোড়া, মচমচে মৃতদেহগুলো মেঝে ও জানালার পাশে পড়ে থাকে। সকালবেলা কচু মারিয়া ঝাড়ু দিয়ে সেগুলো তার প্লাস্টিকের ডাস্টবিনে করে ফেলে দেয়। তখন বাতাসে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়।

জুন মাসের বৃষ্টির সময়টাও বদলায়নি।

আকাশ যেন ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা হাতুড়ির মতো আঘাত করছিল মাটির গায়ে। পুরোনো কূপগুলো পানিতে ভরে গিয়েছিল। শেওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছিল শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো। বিরাট এলাকাজুড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, বিরামহীন বোমাবর্ষণের মতো। সবুজ রঙের পুকুরগুলো যেন সবুজ মন। বৃষ্টি অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তোলে; আনন্দের স্মৃতি, মন খারাপ করা স্মৃতি। ঘাসগুলো সতেজ সবুজ ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। লাল রঙের কেঁচোগুলো মনের সুখে যেন নরম কাদার ওপরে নাচছিল। নুইয়ে পড়েছিল সবুজ আগাছাগুলো। গাছগুলো নত হয়েছিল। বেশ কিছু দূরে বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে নদীর তীরে হাঁটছিল এসথা। হঠাৎ হঠাৎ বজ্রের আওয়াজ হচ্ছিল। আকাশ ছিল অন্ধকার। এসথার পরনে ছিল থেঁতলানো স্ট্রবেরি রঙের টি-শার্ট, ভিজে সেটা কালো হয়ে গেছে। সে বুঝতে পেরেছিল রাহেলও এসেছে।

এসথা সব সময় শান্ত ছিল। তাই কখন সে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল তা কেউ ঠিক করে (বছর, কিংবা দিনক্ষণ) বলতে পারবে না। অর্থাৎ একেবারে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল। আসল কথা হলো 'নির্ভুল সময়' বলতে কিছু নেই। ধীরে ধীরে এটা ঘটে চলেছিল এবং একসময়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার এ শান্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা লক্ষ করার মতো কোনো বিষয় ছিল না। কেউ সেটা লক্ষ করেনি। যেন তার কথাবার্তা বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। যেন বলার মতো আর কোনো কথা ছিল না। তবু এসথার নীরবতা কখনোই অস্বাভাবিক ছিল না। আকস্মিক ব্যাপার ছিল না মোটেই। কখনোই হইচই করার মতো ছিল না। এ নীরবতা কাউকে দোষারোপ করার জন্য নয়, এটি ছিল প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি প্রতিবাদমাত্র। একটি সুপ্তাবস্থা। গোটা শুকনো মৌসুমে লাংফিশ নিজেদের লুকিয়ে রাখে। মানসিকভাবে এটা ছিল সে রকম ব্যাপার। কিন্তু এসথার ক্ষেত্রে ওই শুকনো মৌসুম যেন চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছিল।

বহুদিন ধরে অভ্যাসের মাধ্যমে নিজেকে আড়াল করে রাখার সামর্থ্য অর্জন করেছিল সে। সে যেখানেই থাকুক—বইয়ের মধ্যে, বাগানে, পর্দার আড়ালে, দরজায় কিংবা পথেঘাটে—তার উপস্থিতি ছিল নির্জীব, অপরিচিত কেউ তার দিকে তাকাতই না। এমনকি একই কক্ষে থাকার পরও তার ওপর নতুন লোকদের চোখ পড়তে বেশ সময় লাগে। সে যে মোটেই কথা বলে না, সেটা টের পেতেও সময় লেগে যায়। কেউ কেউ সেটা খেয়ালও করে না।

এসথা এ পৃথিবীর অত্যন্ত ছোট একটি জায়গা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল নিজের জন্য।

সোফি মলের শেষকৃত্যের পরে এসথাকে যখন তার বাবার কাছে পাঠিয়ে

দেওয়া হলো, বাবা তাকে কলকাতার একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সে ব্যতিক্রমী কোনো ছাত্র ছিল না, আবার খুব খারাপও ছিল না। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়েও সে খারাপ ছিল না। তার বার্ষিক রিপোর্টে শিক্ষকেরা সাধারণত 'একজন গড়পড়তা ছাত্র' অথবা 'কাজকর্ম সন্তোষজনক' বলে তার সম্পর্কে মন্তব্য করতেন। তবে তার সম্পর্কে বারবার যে অভিযোগটি আসত সেটি হলো 'সে দলীয় কার্যক্রমে অংশ নেয় না'। যদিও 'দলীয় কার্যক্রম' বলতে তাঁরা ঠিক কী বোঝাতে চাইতেন তা কখনো উল্লেখ থাকত না।

মাঝারি ফলাফল নিয়ে এসথা স্কুল শেষ করল। কিন্তু সে কলেজে পড়তে রাজি হলো না। তার বদলে সে ঘরের কাজকর্ম করা শুরু করে দিল। প্রথম দিকে সেটা তার বাবা ও সৎমাকে বিব্রত করে তুলত। যেন সে তার নিজস্ব পথে উপার্জনের চেষ্টা করে চলেছে। সে ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা এবং সব রকম ধোপার কাজ করত। তৈলাক্ত ও ঝকঝকে সবজির স্তূপের পেছনে বসে থাকা বাজারের সবজি বিক্রেতারা তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অন্যান্য খরিদ্দারের চেয়ে তাকে বেশি খাতির করত। তাকে ওরা কয়েকটি জং ধরা ফিল্মের কৌটা দিয়েছিল। সেটাতে সে তার তুলে নেওয়া সবজিগুলো রাখত। সে কখনো দরাদরি করত না এবং তারাও কখনো তাকে ঠকাত না। সবজিগুলো মাপার পর দাম দেওয়া হয়ে গেলে তারা সেগুলো লাল প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ভরে দিত (সবার নিচে পেঁয়াজ, তার ওপরে বেগুন এবং সবার ওপরে রাখত টমেটো)। কিছু ধনেপাতা আর এক মুঠো কাঁচা মরিচ এমনিই দিয়ে দিত। যাত্রীভর্তি ট্রামে চড়ে এসথা সেগুলো ঘরে নিয়ে আসত। মনে হতো এক সমুদ্র গোলমালের মধ্যে শান্ত একটি বুদ্‌বুদ ভেসে চলেছে।

খাওয়ার সময়ে কিছু প্রয়োজন হলে সে নিজেই উঠে সেটা নিয়ে নিত।

একবার নীরবতা উপস্থিত হলে সেটা এসথার মধ্যে স্থান করে নিত এবং ছড়িয়ে পড়ত। এটা তার মাথা থেকে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরত তার ভেজা হাতগুলোকে। একটি প্রাচীন ভ্রূণের হৃৎস্পন্দনের ছন্দের মতো সেটা তাকে নাড়া দিত। ওই নীরবতা একটি শোষক শুঁড় পাঠিয়ে দিত তার মাথার খুলির ভেতরে। সেটি তার মাথার প্রতিটি ইঞ্চি থেকে শুষে নিত স্মৃতিগুলোকে, অপসারণ করে দিত পুরোনো কথাগুলো এবং ঝাড়ু দিয়ে তার জিহ্বার ডগা থেকে সেগুলো পরিষ্কার করে নিত। যে চিন্তাগুলোকে শব্দের মাধ্যমে সাজিয়ে সে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারত, এটা তার সে চিন্তাশক্তি কেড়ে নিয়েছিল। সে বাক্‌হীন ও অবশ হয়ে পড়েছিল। হয়তো সে জন্য সে কারও দৃষ্টিতে পড়ত না। ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে এসথা পৃথিবী থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। তার ভেতরের অসুস্থ অক্টোপাসটির সঙ্গে বেড়ে উঠতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেটা তার অতীতের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘুমের কালো প্রলেপ। ক্রমান্বয়ে হারিয়ে গিয়েছিল

তার নীরবতার কারণ। স্মৃতিগুলোর শীতল ভাঁজের গভীরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। আসলে তার মনের যন্ত্রণাই স্তব্ধ করে দিয়েছিল তাকে।

এসথার অতি প্রিয় একটি কুকুর ছিল। নাম খুবচান্দ। সংকর জাতের কুকুরটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গায়ের সব লোম উঠে গিয়েছিল। খুবচান্দ দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল এবং খুব কষ্ট পেতে লাগল, তখন এসথা এমনভাবে তার সেবা করতে লেগে গেল যেন এটা তার শেষ অগ্নিপরীক্ষা। মনে হলো যেকোনো কারণেই হোক, তার জীবন এটার ওপর নির্ভরশীল। জীবনের শেষ দিনগুলোতে খুবচান্দ পেছন দিকের বাগানে যাওয়ার দরজার নিচে ওর জন্য বানানো ফটকের কাছে চলে যেত। সেটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের প্রস্রাবে ঘরের *ভেতরটা* ভরিয়ে দিত। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। মূত্রথলি খালি করার পর সে তার পাঁশুটে রঙের মাথার খুলির ওপর বসানো অস্বচ্ছ সবুজ চোখ দুটো দিয়ে এসথার দিকে তাকাত এবং মেঝেতে ভিজে পায়ের দাগ ফেলে ধীরে ধীরে তার স্যাঁতসেঁতে কুশনে ফিরে যেত। খুবচান্দ যখন মরে তার কুশনের ওপর শুয়ে ছিল, এসথা শোবার ঘরের জানালায় তার মসৃণ, রক্তিম অণ্ডকোষ দুটির প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। এবং অনেক দূরের আকাশের প্রতিবিম্বও। একবার একটি পাখি উড়ে গেল। সেটার প্রতিবিম্বও জানালায় এসে পড়ল। এসথার মনে হলো, ছোট ছোট বাসি গোলাপ থেকে ভেসে আসা গন্ধ, একজন ভেঙে পড়া মানুষের রক্তাক্ত স্মৃতি—এগুলোই হলো বাস্তবতা। এর মধ্যে এ রকম অতি ভঙ্গুর, নরম জিনিসগুলো যে বেঁচে থাকার *সুযোগ* পেয়েছে, এটা এক অলৌকিক ব্যাপার। একটি বুড়ো কুকুরের অণ্ডকোষের ওপর উড়ে যাওয়া পাখির প্রতিবিম্ব পড়েছে এটা দেখে তার হাসি পেয়ে গেল।

খুবচান্দের মৃত্যুর পর এসথা হাঁটা শুরু করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটত সে। প্রথম দিকে শুধু তার পাড়ার মধ্যেই হাঁটত। ক্রমান্বয়ে দূর থেকে দূরে চলে যেত।

তাকে রাস্তায় দেখতে দেখতে লোকজন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখত একজন সুসজ্জিত লোক নিঃশব্দে হাঁটছে। রোদে পুড়ে মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল, কুঁচকে গিয়েছিল চামড়া। মুখে একটা রুক্ষ ছাপও পড়েছিল। আসলে সে যতটা না, তার চেয়ে অনেক বিজ্ঞ দেখাত তাকে। দেখে মনে হতো শহরে একজন জেলে এসেছে, যার কাছে রয়েছে সমুদ্রের অনেক রহস্য।

এসথাকে আবার আইমেনেমে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। সে এখন সারা আইমেনেম শহরে ঘুরে বেড়ায়।

কয়েক দিন সে নদীর তীর ধরে হেঁটেছিল। কিন্তু সেখানে বিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণে কিনে আনা কীটনাশকের গন্ধ পাওয়া যেত। বেশির ভাগ মাছই মারা গিয়েছিল। যেগুলো বেঁচে ছিল, সেগুলোর ডানায় পচন ধরেছিল; ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল চামড়া।